প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড় এবং গাঙ্গে বন্দরের বাণিজ্যিক প্রভাব

প্রভাত নস্কর

সামুদ্রিক বাণিজ্য কেবলমাত্র এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নানা দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির মারফৎ অর্থ লাভের সুযোগ করে দেয় না। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারে সাথে যুক্ত মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থানীয় ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রে (বন্দর ও বন্দর সংলগ্ন বাজার) ও পদ্ধতির উন্নতি, বিনিময় মাধ্যমের প্রসার, জীবিকা অর্জনের নূতন নূতন ক্ষেত্রের উদ্ভাবন, দেশের কোন এক বন্দর কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন বস্তুর আমদানি, অনুরূপভাবে দেশ বা বিদেশ থেকে দ্রব্য সমূহের রপ্তানি, এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের যাতায়াত, বহিরাগত ব্যবসায়ী পরিবারে বসতি স্থাপন, বাইরের মানুষের সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের পরিচিতি, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বৈবাহিক ও অন্যান্য সামজিক সম্পর্ক স্থাপন, শিল্প ও স্থাপত্যে বাহিরের প্রভাব ইত্যাদি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিকাঠামের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। সুতরাং প্রাচীন তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড় ও গাঙ্গে বন্দরের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাস চর্চা প্রাচীন বাংলার (পূর্ব ভারতের) ইতিহাস অনুসন্ধান ও সাধনার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু ইতিহাসের ধারার সঠিক অনুধাবনের জন্য কালানুক্রমের ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মচর্চার প্রক্রিয়াগুলির পারস্পরিক নির্ভরতার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা কঠিন এই কারণে যে সামাজিক ইতিহাস রচনা শুধুমাত্র সাহিত্যগত সূত্রের ভিত্তিতে করা হয় এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাবিজ্ঞান, লেখ প্রভৃতি উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয় তবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবশ্য সাহিত্যগত এই স্থানভিত্তিক প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উভয় উপাদানের সাহায্যের প্রয়োজন। একথা বলা প্রয়োজন যে সমগ্র সূত্রাবলীর তুলনামূলক আলোচনার ওপর নির্ভর করে অর্থ, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রচনা করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন সূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের (প্রাচীন বাংলাদেশের) অর্থনৈতিক, সামজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রচনার প্রধান সমস্যা হল, প্রাচীনকালে ভারতবাসীগণ সাহিত্যের নানা বিভাগে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করলেও নিজেদের দেশের অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখায় নি। এর ফলে

প্রাচীন বাংলার তথা প্রাচীন ভারতের বহু ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে কারণে আলোচ্য প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দর 'তাম্রলিপ্তি ও গাঙ্গে'[১] এবং চন্দ্রকেতুগড়-এর বাণিজ্যিক প্রভাব প্রাচীনকালে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিরূপ ছিল তা জানার জন্য প্রাচীন দেশীয় সাহিত্য, বৈদেশিক ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের বিবরণ এবং এই বন্দরকেন্দ্রিক নানা স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমুখ এই সমস্ত কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয়।

প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড় ও গাঙ্গেকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে বাংলায় বন্দরকেন্দ্রিক এক নাগরিক সভ্যতার বিকাশ লাভ করে ছিল। আধুনিকালের নগরের মতো প্রাচীনকালেও বাংলার নগরেও ছিল বিজ্ঞানসম্মত নানা সুব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত, যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে মাটির গভীরে আবিস্কৃত হয় আবর্জনাকুন্ড ও পানীয় জলের জন্য কুয়ো বা নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি প্রৌরার্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টির পরিচয়। এই উন্নত নগরী গড়ে ওঠার সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর মতে, ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রর বা এলাকার মানুষের উন্নত জীবনযাত্রা ওই স্থানের বাণিজ্যিক উন্নতির পরিচায়ক[২]।

বর্তমান অবস্থানের নিরিখে প্রাচীন বাংলার আলোচ্য এই তিন বন্দরের কেন্দ্রস্থল চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, আটঘরা, হরিনারায়ণপুর, দেগঙ্গা, কাঁথি প্রমুখ স্থানে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত হাজার হাজার মৃত্তিকাফলক যাতে ধরে রাখা আছে প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক সমাজচিত্র, দৈনন্দিন জীবনের ছায়াছবি — কেশ বিন্যাস, অলঙ্কার, পোশাক পরিচ্ছদ, যান-বাহন, সমবেত ভোজন, নৃত্য-গীত, পূজা পদ্ধতি, শোভাযাত্রা, উৎসব, দেব-দেবী, যৌনজীবন, দেশি-বিদেশি মানুষ, গাছপালা, পশু-পাখি, রাজসভা থেকে দারিদ্রের পর্ণকুটীর। প্রাচীন বাংলার মানুষের সজীব এবং ধারাবাহিক সামাজিক ইতিহাস এই প্রত্নদ্রব্যসমূহের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সংগৃহীত এই টেরাকোটা ফলকগুলিকে লক্ষ্য করলে প্রাচীন বাংলার নর-নারীর দৈনন্দিন জীবন, কর্মব্যস্ততা, বৃত্তি বা জীবিকা ও অবসর বিনোদনের বাস্তব ছবি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে। এই বন্দর এলাকায় প্রাপ্ত বিদেশি নরনারীর প্রতিকৃতি ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ইঙ্গিত করে প্রাচীনকালে বন্দরকে কেন্দ্র করে বাংলায় দেশ-বিদেশের মানুষের মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। নারীমূর্তি বা দেবীমূর্তিতে দেখা যায় গ্রীক নারীদের পরিধান সাদৃশ্য পোশাক পরিচ্ছদ, (নারী ও পুরুষ পরিধান করত সূক্ষ্ম সূতিবস্ত্র বা জগৎ বিখ্যাত বাংলার মসলিনও হতে পারে) দৈহিক গঠন এর প্রভাব, যা গান্ধার শিল্পরীতির আভাস দেয়।[৩] এছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকে সৈনিক মূর্তির যুদ্ধ-সজ্জাও হেলেনীয় ও রোমক-রীতি সূচক।[৪] প্রাচীন বাংলায় জীবিকার সন্ধানে বাণিজ্যিক

সূত্রে আগত অভিবাসীরা এখনকার চন্দ্রকেতুগড় ও বোধ হয় তমলুক অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।[৫] যা প্রাচীন বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক তথা সমাজ জীবনের সাথে অভিবাসী এই বণিক সম্প্রদায়ের মেলবন্ধন টেরাকোটার ফলক নির্মাণকারী শিল্পীরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

নদীমাত্রিক প্রাচীন বাংলা কৃষিকার্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এখানে ধান, তুলা আখ, সর্ষে, নারকেল এবং সুপারি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হত। বর্তমানের ন্যায় প্রাচীনকালেও বঙ্গবাসী খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ভাত (ধান তথা চাল থেকে প্রস্তুত) গ্রহণ করত। এর সাথে উক্ত বন্দর এলাকা দিয়ে বিদেশে বঙ্গদেশের ধান ও আখের রস হতে প্রস্তুত চিনি বাইরে রপ্তানি করা হত।[৬] যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বন্দর এলাকার মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত ধানের তুষের সন্ধান।[৭] গৃহপালিত পশুর মধ্যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঘোড়ার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বাংলার নানা স্থান থেকে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত মৃত্তিকাফলকে উৎকীর্ণ নানা ভঙ্গিমায় বিরাজমান অশ্ব ও অশ্বারোহীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বি.এন. মুখোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গে ঘোড়া আমদানি করে তাকে নানাভাবে সুশিক্ষিত করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও চীনে উচ্চ মূল্যে রপ্তানি কর হত।[৮] এছাড়া ব্যাবসার প্রয়োজনে হাতি পোষা হত। হাতির দাঁত ও হাড়ের তৈরি সৌখিন জিনিস বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেত।[৯] অনুমেয় হয় প্রাচীন বাংলার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ ও জাতীর বি-ভাজনের আধিক্য না থাকায় বাণিজ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে নিয়োজিত সুদক্ষ শিল্পীরা (কর্মকার, অলংকরণরত খোদাইকর, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রমুখ) তাদের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের জন্য সমাজে সমাদর ও শিল্পের বিভাজন অনুযায়ী পরিচিতি লাভ করত।

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড় ও গাঙ্গে বন্দরের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশ-বিদেশের সঙ্গে এই তিন বন্দরের বাণিজ্যস্রোত বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। কিন্তু বাঙ্গালি বণিকদের সামুদ্রিক অভিযানের নির্ভুল চিহ্ন হিসাবে থেকে গেছে নানা বাণিজ্য দ্রব্য। কিছু দ্রব্য স্থানীয় উৎপাদন, কিছু বিদেশাগত। উৎখনন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সব সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া কিছু প্রাচীন দেশিয় সাহিত্য এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ এর ফলে প্রাচীন বাংলার গৌরবময় বাণিজ্যিক ইতিহাস সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন যবনিকা বেশ কিছুটা সরাতে স্বক্ষম হয়েছে। প্রাচীন ভারতের যে নির্মীয়মান অর্থনৈতিক, ইতিহাস, তাতে প্রাচীন বাংলা বাণিজ্যিক দিক দিয়ে নিজের জায়গা নিজেই করে নিয়েছে।

খ্রিস্টিয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে যখন ভারত-রোম বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও

প্রসার ঘটে, তখন প্রাচীন বাংলার চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্তি ও গাঙ্গে বন্দর সামুদ্রিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করত। এই সব বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি থেকে রোমান পানীয় পাত্র অ্যাম্ফোরার[১০] অনুকরণে নির্মিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। সর্বোপরি ভারতীয় কিছু মুদ্রায় রোমান 'দিনারে'র উল্লেখ রোম - ভারত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে।[১১] রোম থেকে আগত ব্যবসায়ীরা সম্ভবত অভিবাসীরূপে ঘোড়া ও চালের ব্যাবসায়ে অংশ নিত।[১২] তবে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় ভারত-রোম বাণিজ্য সূত্রে বঙ্গদেশের পণ্যসামগ্রী বা দ্রব্যাদি দক্ষিণ ভারতের মধ্য দিয়ে রোমে রপ্তানি হত। এছাড়া প্রাচীনকালে এই বন্দর সমূহ থেকে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির বর্ণনা পাওয়া যায় চি'এন-হন শু, পেরিপ্লৌস তেস ইরিথ্রাস থালাস্সেস, ফু নান চুয়ান, লিয়াং-শু, পত্তুপাট্টুর অন্তর্গত পট্টিন-পপলই প্রভৃতি গ্রন্থে এবং কিছু খরোষ্ঠী ও খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী লেখতে। বাণিজ্য সামগ্রীর মধ্যে, মধ্য-এশিয়া থেকে ঘোড়া আমদানি করা হত।[১৩] বাংলা থেকে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে (শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, চীন) রপ্তানির তালিকায় ছিল ঘষা কাঁচ, খুব উঁচু দরের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, রেশমের বস্ত্র, চাল ইত্যাদি। সোনা, রূপা, পট্টবস্ত্র, কড়ি প্রভৃতি আমদানি করা হত। আমদানি করে রপ্তানি করা হত হিমালয় অঞ্চলে জাত তেজপাতা ও কয়েক প্রকার গুল্ম পিষে তৈরি সুগন্ধ তেল এবং মুক্তা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সোনা ও রুপাকে (মুদ্রা হিসাবে) গুরুত্ব দেওয়া হত। তবে স্থানীয় বাণিজ্যে চালু ছিল এক শ্রেণির তামার মুদ্রা ও কড়ি।[১৪] মৌর্য যুগের মহাস্থান-লেখতে উল্লেখিত 'কাকিনী' যদি কপর্দক বা কড়ির ইঙ্গিত করে, তাহলে প্রাচীনকালে বাংলার এই বন্দরগুলিতে মালদ্বীপ থেকে বহু পরিমাণ কড়ি আমদানি করা হত।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী চারিদিক নদী বেষ্টিত বাংলার উপকূলভাগে বর্তমানের ন্যায় প্রাচীনকালেও বিবিধ কৃষিজ ফসল উৎপন্ন হত। এই কৃষিজ ফসল বাণিজ্যিক করণের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার কৃষক ও ব্যবসায়ী উভয়ই অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হত। এখানে ধান, তুলা, আখ, সর্ষে, নারকেল এবং সুপারি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হত। চন্দ্রকেতুগড় থেকে ধানের তুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। বি.এন. মুখার্জির মতে, বাংলা থেকে কুষাণ আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাহাজে করে শস্য রপ্তানি করা হত।[১৫] এছাড়া প্রাচীন বাংলা অনাদিকাল থেকেই বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে তুলা ও রেশমগুটি চাষ হতো যথেষ্ট পরিমাণে। যা দিয়ে উৎপন্ন বস্ত্র গ্রাম ও নগরের প্রয়োজন মেটাত। এর সাথে এই বস্ত্র বাংলা থেকে দেশ-বিদেশে বাণিজ্যে রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ক্ষৌম, দুকূল, পাত্রার্ণ ও

কার্পাসিক নামে বঙ্গের চারপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কৌটিল্যের মতানুযায়ী বাণিজ্যিক গুরুত্ব বেশি ছিল বঙ্গ দেশীয় স্নিগ্ধ 'দুকুল' বস্ত্রের। কার্পাস তুলো থেকে প্রস্তুত কাপড়েরও যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল।[১৬]

বাণিজ্যের প্রসার, সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উন্নত অর্থনীতির পরিচায়ক হল মুদ্রা।[১৭] বাণিজ্যিক লেনদেন এর কাজে মুদ্রা একান্ত প্রয়োজনীয়। তমলুক, চন্দ্রকেতুগড় ও নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের) নানা স্থান থেকে মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্তযুগের অসংখ্য মুদ্রা প্রাপ্তি, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ বাণিজ্যের সূচক। বাংলার নানা স্থান থেকে দু'হাজার বছরের আগের বহু তামার ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা (Cast Copper Coin) ও Silver Punch Mark Coin পাওয়া গেছে। যাকে ভারতের 'প্রাচীনতম মুদ্রা বলা হয়।[১৭] বাংলার নানা স্থান থেকে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও তামার সাথে অন্য ধাতুর মিশ্রিত মুদ্রা (বিলন মুদ্রা) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এছাড়া, চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুক অঞ্চলে এক ধরনের মৃত্তিকা ফলক পাওয়া গেছে যেখানে দেখা যায়, দেবী, যক্ষিণী অথবা লক্ষ্মী কলসী উপুড় করে মুদ্রা ঢেলে দিচ্ছেন আর ভক্তরা সেই মুদ্রা থালা ভর্তি করে নিচ্ছে।[১৮] অনুরূপ ফলক বাংলার এই দুই স্থানের প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় একটি পূর্ণ কলস থেকে উপচে পড়ছে মুদ্রারাশি।[১৯] এই শ্রেণির ফলক যে প্রাচীন বাংলার এই দুটি বন্দরনগরীর ঐশ্বর্য ও স্বচ্ছলতার বার্তা বহন করছে তা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। কোন প্রত্নস্থল থেকে প্রচুর সংখ্যক মুদ্রার আবিষ্কার ইতি করে যে স্থানটি ব্যাবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন বাংলার এই বাণিজ্য কেন্দ্রের আর্থিক সমৃদ্ধি পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করতে সহায়ক হয়েছিল।

বন্দর-নগরী তমলুক, চন্দ্রকেতুগড় এবং আটঘরা, হরিহরপুর, মন্দিরতলা, কাঁথি, দেগঙ্গা (প্রাচীন গঙ্গারিডি রাজ্যের অংশ) প্রমুখ স্থানে বাস করতেন ধনাঢ্য বহু বণিক ও নাগরিক। তাদের বাণিজ্য - গৌরব, আড়ম্বর, বিলাস ও বর্ণাঢ্য জীবন প্রতিফলিত হয়েছে এখানে প্রাপ্ত অসংখ্য মৃৎ-ফলক অঙ্কিত নরনারীর অলংকার, পোশাক পরিচ্ছদ, রত্ন-উপরত্ন ও মুদ্রায়। বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর লাভের আশা যেমন ছিল, ঠিক তেমন বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা সব সময় সুখকর হত না। জাহাজ ডুবি বা সামুদ্রিক ঝড়ে কষ্ট পাবার অনেক কাহিনিই এর সাথে যুক্ত। যে কারণে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া ও বাণিজ্যে সাফল্য লাভের আশায় প্রাচীন বাংলার বণিকশ্রেণি নানা ধরনের দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছে। যার প্রমাণ স্বরূপ বাংলার নানা স্থান থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে আধিকাংশই বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি: যক্ষ - যক্ষী, লক্ষ্মী কুবের, গণেশ ইত্যাদি। ঠিক যেমনটি দেখা গিয়ে ছিল প্রাচীনকালে রোমান বণিকদের

সমুদ্রযাত্রায় পূর্বে পোতাধ্যক্ষ ও নাবিকদের পৃষ্টপোষক দেবী আফ্রোদিতের পূজা-অর্চনার মাধ্যমে দৈব্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হত।[২০]

সমাজে বিবিধ বৃত্তিজীবি মানুষ তাদের নিজস্ব জগৎ ও নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে কর্মে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে নানা দেব-দেবীর অবতরণ ঘটিয়ে তাঁর পূজা-অর্চনা শুরু করেছিল। কী আধুনিককালে, কী অতীতে। যেমন ধীবর সম্প্রদায়ের উপাস্য গঙ্গা, ব্যবসায়ীদের গণেশ, বণিকদের গন্ধেশ্বরী, কারুশিল্পীদের বিশ্বকর্মা প্রভৃতি। ঠিক অনুরূপ ভাবে প্রাচীনকালের বণিকশ্রেণির জগৎ, জাগতিক অভিজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা ও বাণিজ্যে লাভের আশায় নানা দেব-দেবীর উপাসনা শুরু করেছিল। এই উপাস্য দেব-দেবীর অনেকেই ধন-ঐশ্বর্য, শস্য, সমুদ্র বা উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত। এই সব দেব-দেবীদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বণিকশ্রেণির আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও কৃতজ্ঞতাবোধ।

বিপদ - আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাচীনবাংলার (প্রাচীন ভারতের) বণিকশ্রেণি দেব-দেবীর পূজা অর্চনার সাথে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে তুষ্ট করার জন্য মণিরত্ন ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি জলে অর্পণ করে পূজা করতেন[২১] এবং তাবিজ ধারণ করতেন। তমলুক অঞ্চল থেকে এরূপ একটি মাটির তাবিজ পাওয়া গেছে। তাবিজটির উপরে খরোষ্টী-ব্রাহ্মী লেখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, "সমুদ্রে (বিপদে) দ্বিজের স্মরণ নেবে"।[২২] ঠিক একই রকম প্রাচীন চীনা বণিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল ড্রাগন হল সমুদ্র ঝড়ের সৃষ্টিকর্তা। এই ধারণা থেকে ড্রাগনকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা রত্ন, মুক্ত ও বিবিধ উপহার সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করত।[২৩]

বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভের জন্য বণিকরা পণ্য সিদ্ধি অনুষ্ঠানও পালন করত। এই অনুষ্ঠানের সময় প্রত্যেক বণিক নিজের পণ্যদ্রব্যের কিয়দাংশ পবিত্র অগ্নিকুন্ডে আহুতি দিয়ে প্রার্থনা করতেন যে, "পুরাতন মূলধনের সাহায্যে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে আমরা যে নতুন অর্থলাভ করার চেষ্টা করছি সোমদেব সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলুন"। হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্রে এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ আছে।

অজানা প্রতিকূল সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়ে নাবিক ও বণিকদের প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ ও প্রবল শক্তির সামনে নিজেদের অসহায়বোধ করাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাই সমুদ্র যাত্রার পূর্বেই নিরাপত্তা বিধান ও বাণিজ্যিক সিদ্ধিলাভের জন্য নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা ছিল। এই ভয়, কৃতজ্ঞতা ও বাণিজ্য লাভের আশায় প্রাচীন বাংলার বণিকগণ যক্ষ ও যক্ষিণী, কুবের, লক্ষ্মী, অগ্নি, গণেশ, শস্যদেবী, বৌদ্ধ বণিকরা অবলোকিতেশ্বরের পূজা-অর্চনা বিশেষ জাঁকজমক এর সাথে শুরু করেছিল। যার নিদর্শন চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্তি, গাঙ্গে, প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান এই তিন বন্দরের কেন্দ্রস্থল রেখে

গেছে। যে কারণে এই বন্দরের কেন্দ্রস্থল চন্দ্রকেতুগড়, আটঘরা হরিহরপুর, মল্লিকপুর, হরিনারায়ণপুর, দেগঙ্গা, দেউলপোতা, পাকুড়তলা, মন্দিরতলা, পুকুরবেড়িয়া ও মেদিনীপুর জেলার তিলডা, পান্না, কাঁথি, তমলুক প্রমুখ স্থান থেকে আজও প্রাচীন যুগের মুদ্রা ও ফলকে খোদিত দেব-দেবীর মূর্তি এবং বহুপোড়ামাটির আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। এরূপে বাংলার মানব সংস্কৃতির নানা বিষয় এর মধ্য দৈব আরাধনা সেই প্রাচীনযুগ থেকে আজও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। দৈব আরাধনার বিবিধ রূপের অন্যতম রূপকার ছিল প্রাচীন বাংলার বণিক শ্রেণি।

পাদটিকা —

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ২০০।
২। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ বঙ্গাল ও ভারত, পৃঃ ১৪।
৩। ডঃ গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, প্রসঙ্গ ঃ প্রত্ন-প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়, পৃঃ ৫৫।
৪। গৌরীশঙ্কর দে, 'চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎশিল্পে গান্ধারশৈলী', ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, ১৯৯৪, পৃঃ ৭৩।
৫। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭।
৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, (১৯৪৯), পৃঃ ১৩৫-১৩৭।
৭। চন্দনা ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের সন্ধানে', আবহমান, ২০১২, পৃঃ ৫।
৮। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ বঙ্গাল ও ভারত, পৃঃ ২৮-২৯।
৯। ডঃ গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।
১০। পল বাহন (সম্পাদক), কলিনস ডিক্সনারী অফ্ আর্কিয়োলজি, পৃঃ ৩১।
১১। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৩।
১২। ব্রতীনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭।
১৩। গৌরীশঙ্কর দে, 'চন্দ্রকেতুগড়ের ঘোড়া', ইতিহাস অনুসন্ধান ১০, ১৯৯৫, কলকাতা, দ্রষ্টব্য।
১৪। ডঃ গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।
১৫। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭।
১৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড (প্রাচীনযুগ), পৃঃ ১৯৮-১৯৯।
১৭। চন্দনা ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের সন্ধানে', আবহমান, ২০১২ পৃঃ ৬।
১৮। গৌরীশঙ্কর দে, চন্দ্রকেতুগড়ের এ লষ্ট সিভিলাইজেশন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬-৮।
১৯। পি.সি. দাশগুপ্ত, দি আর্কিয়েলোজিক্যাল ট্রেজারস্ অফ তাম্রলিপ্ত, পৃঃ ৭।
২০। এ.কে. সিংহ, ইন্দো রোমান ট্রেড, পৃঃ ৭৩।
২১। গোরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৩।
২২। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।
২৩। Myths of China and Japan, P 76-94.